দুর্যোগের সাথে বসবাস

ইউনিট ৯

ভূমিকা

সাম্প্রতিক সময়ে সারাবিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা এবং তীব্রতা বাড়ছে। আগামী দশকগুলোতে বিশ্ববাসীকে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ যে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে তা হলো বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন, সাইক্লোন, টর্নেডো প্রভৃতি। এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রকৃতি সংরক্ষণের কৌশলসমূহ আয়ত্ত করতে হবে। আলোচ্য ইউনিটে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত সমস্যাসমূহ, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ এবং প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৯.১ : জলবায়ু পরিবর্তন : বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট
পাঠ - ৯.২ : পরিবেশগত সমস্যাসমূহ
পাঠ - ৯.৩ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ
পাঠ - ৯.৪ : প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য ও কৌশল

পাঠ-৯.১ জলবায়ু পরিবর্তন : বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জলবায়ু পরিবর্তন কাকে বলে তা বলতে পারবেন এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রভাব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	জলবায়ু, জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে জলবায়ু বলতে কী বুঝায় তা জানা প্রয়োজন। জলবায়ু হলো কোনো স্থানের আবহাওয়ার উপাদানগুলোর ৩০ থেকে ৪০ বছরের গড় অবস্থা। বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও গতি, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি হলো আবহাওয়ার উপাদান। আবহাওয়ার উপাদানসমূহের তারতম্যের পরিমাপের সময়কাল এক দশক থেকে সহস্র বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং এর ব্যাপ্তি একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকে বিশ্বব্যাপীও হতে পারে। তাই জলবায়ু পরিবর্তন হলো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকার দীর্ঘমেয়াদে আবহাওয়ার পরিবর্তন। আমরা জানি, প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী প্রতিদিন পৃথিবীতে যে সূর্যকিরণ পৌঁছায় ভূ-পৃষ্ঠ তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির এই শোষণ ও বিকিরণের নিয়মে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর জলবায়ু অতীতেও পরিবর্তিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পরিবর্তিত হবে বলে জলবায়ু বিজ্ঞানীগণ আশঙ্কা করছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ (Causes of Climate Change) : জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে থাকে মূলত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming) নামে পরিচিত। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় বহুবিধ কারণে। নিম্নে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো উল্লেখ করা হলো:

১। অতিমাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি।

২। যানবাহনের অদগ্ধীভূত কার্বন যেমন- কার্বন মনো-অক্সাইড (CO), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) প্রভৃতি নির্গত হয়ে দূষণ সৃষ্টি।

৩। তেজস্ক্রিয় দূষণ যেমন- ১৯৮৬ সালে রাশিয়ার চেরনোবিল পরিমানবিক দুর্ঘটনা।

৪। শিল্পকারখানার নির্গত ধোঁয়া ও বিষাক্ত বর্জ্য এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোর অতিমাত্রায় শিল্পায়ন।

৫। অপরিকল্পিতভাবে বনভূমি উজাড় অথবা বনভূমি এলাকায় বিস্তৃত দাবানল।

৬। মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী (যেমন- এয়ার কন্ডিশনার, প্রসাধন সামগ্রী, প্লাস্টিক সামগ্রী)।

৭। জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি ও অসম বন্টন।

৮। ওজোন স্তর ক্ষয় হয়ে সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছানো।

৯। কৃষিক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পানি দূষিত হয়ে ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া।

১০। ফসলের অবশিষ্টাংশ পচন ও ধানক্ষেত থেকে উদ্ভূত মিথেন।

১১। সূর্যের শক্তি উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি (এ হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে সৌরদীপ্তি চক্র বা Sunspot Cycle এর উপর)।

১২। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণ।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের বিপদাপন্নতা (Climate Change and Vulnerability of Bangladesh) : পৃথিবী ব্যাপী জলবায়ুর যে পরিবর্তন হচ্ছে তার ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশেও কিছু কিছু নমুনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রভাবসমূহ তুলে ধরা হলো-

১. **ঋতুর পরিবর্তন :** ষড়ঋতুর দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের প্রতিটি ঋতু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঋতুর আগমন এবং প্রস্থানের সময়কালের সামান্য পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন-আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল হলেও আশ্বিন মাসেও ভারী বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায় এবং অসময়ে বন্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে, পৌষ ও মাঘ মাস শীতকাল হলেও ফাল্গুন ও চৈত্র মাস পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলে রাতে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয় এবং লেপ, কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমাতে হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় প্রভৃতি জেলায় শীত ঋতুর পরেও আকাশে দুপুর পর্যন্ত ঘন কুয়াশা দেখা যায়, যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। এছাড়া শরৎ, হেমন্ত, শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল তারও কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গ্রীষ্মকালে কখনও কখনও তীব্র গরম পড়ে এবং তা একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত বিরাজমান থাকে, যাকে তাপদাহ বা দাবদাহ নামে অভিহিত করা হয়। এই তাপমাত্রা কোনো কোনো অঞ্চলে ৪৫°-৪৮° সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে দেখা যায়। ফলে গ্রীষ্মকালে অস্বাভাবিক গরম এবং শীতকালে ঠাণ্ডা পড়ে যা শিশু ও বৃদ্ধ মানুষের জন্য তা খুবই অস্বস্তিকর। ফলে বহু প্রাণহানি ঘটে থাকে।

২. **মরুময়তা :** প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হলে এবং স্থানিক বিচারে তা সমভাবে বন্টিত না হলে মরুময়তা দেখা দিতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চলে খরার প্রকোপ দেখা যায়। জলবায়ুর মৃদু পরিবর্তন হলে খরার ব্যাপ্তি আরও বাড়বে এবং খরা কবলিত এলাকার পরিধিও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ধান, গম, আলুসহ বিভিন্ন কৃষি পন্যের উৎপাদন প্রভাবিত হবে।

৩. **অস্বাভাবিক বন্যা ও নদীর প্রবাহ হ্রাস :** বাংলাদেশের জলবায়ুতে বন্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বন্যা একদিকে যেমন ক্ষতি করে অন্যদিকে তেমনি উপকারও করে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন- ১৯৭৪, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮ ও ২০০৭ সালে বন্যা ছিল প্রলয়ংকারী এবং এতে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এছাড়া ২০১৬ সালেও লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, সুনামগঞ্জসহ দেশের মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বন্যার এ ধারা অব্যাহত থাকলে অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। অন্যদিকে IPCC এর তথ্যানুযায়ী, ২০৩০ সালের পর এদেশের নদীর পানির প্রবাহ অনেক কমে যাবে। যা ইতিমধ্যে অনেক নদীতে দেখা দিয়েছে। অনেক নদী শুধুমাত্র বর্ষাকালে সচল থাকে এবং শুকনো মৌসুমে পানি প্রবাহ একেবারে কমে যায়।

৪. **কৃষি ও মৎস্য সম্পদ :** বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা, স্বল্প বা অধিক তাপমাত্রা কৃষির উৎপাদন ব্যাহত করবে এবং যা ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে পূর্বের মতো দেশীয় মাছ আর পাওয়া যায় না। মাছে ভাতে বাঙালি প্রবাদটি আজ আর সেভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মাছের আবাসস্থল, খাদ্য সংগ্রহ এবং প্রজনন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। ৩২° সেলসিয়াসের অধিক তাপমাত্রা হলে অনেক মাছও মরে যেতে পারে। এছাড়া উচ্চ তাপমাত্রা রোগ-জীবাণু জন্মাতে সহায়তা করায় মাছের রোগ প্রবনতা বেড়ে গিয়ে প্রজাতি হুমকির মুখে পড়তে পারে।

৫. **জীববৈচিত্র্য হ্রাস :** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতিমধ্যে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় ৩৯ প্রজাতির প্রাণি হুমকির সম্মুখীন। এর মধ্যে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, অজগর, বুনো হাঁস,

কালো হাঁস, নীল গাই, বুনো মহিষ, মিঠা পানির কুমির, ঘরিয়াল প্রভৃতি। ধারণা করা হয়, জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে ৩০ শতাংশ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বন বিজ্ঞানীগণের মতে, বাংলাদেশে ১২৫টির মতো বৃক্ষ প্রজাতি বিপন্ন প্রায়। এর মধ্যে কাস্টল ও ঔষধি উদ্ভিদ বিদ্যমান। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৬. **ঘূর্ণিঝড়** : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন ও ধ্বংসাত্বক ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি উল্ল্যেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়েছে। অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আঘাত হেনেছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার সময়কাল উল্লেখ করা হলো:

সারণি ৯.১. ১: বাংলাদেশের সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়সমূহ

সংঘটিত হওয়ার সাল	ঘূর্ণিঝড়ের নাম
১২ নভেম্বর, ১৯৭০	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়
২৯ নভেম্বর, ১৯৮৮	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়
২৯ এপ্রিল, ১৯৯১	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়
১৫ নভেম্বর, ২০০৭	সিডর
২৫ মে, ২০০৯	আইলা

৭. **উপকূলীয় এলাকা** : উপকূলীয় জোয়ার-ভাঁটার স্রোত, বন্যা, নদী ক্ষয়, লবণাক্ততা প্রভৃতির দ্বারা উপকূলীয় এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে উপকূলীয় এলাকার অনেক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে এ অঞ্চলে বসবাসকারী ৩০ মিলিয়ন মানুষ ও নানা প্রজাতির জীবজন্তু, সম্পদ প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

৮. **খাদ্য নিরাপত্তা** : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেকেই কৃষি জমি হারাবে। বাংলাদেশে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়, সিডর, আইলা প্রভৃতির প্রভাবে কিছু জমিতে সাময়িক উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। যদিও বর্তমানে বাংলাদেশ প্রধান খাদ্য ধান উৎপাদনে প্রায় স্বাবলম্বী।

৯. **লবণাক্ততার পরিমাণ** : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে দক্ষিণাঞ্চলের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হলে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ১৩% কৃষি জমি ইতিমধ্যেই লবণাক্ততার শিকার হয়েছে। ২০৫০ সাল নাগাদ তা ১৬% এবং ২১০০ সাল নাগাদ ১৮% এ পৌঁছাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুতরাং বলা যায় যে, সমুদ্র পৃষ্ঠের পানি বৃদ্ধি বাংলাদেশকে নানাভাবে প্রভাবিত করবে এবং সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি হবে।

১০. **স্বাস্থ্য ঝুঁকি** : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির মাত্রা বেড়ে গেলে দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন রোগ- জীবাণু ছড়াবে যা জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে। এ ধরনের দুর্যোগের পরে নানাবিধ রোগ যেমন- কলেরা, ডায়রিয়া, চর্মসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ বেড়ে যাবে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অ্যানথ্রাক্সের মতো অনেক প্রাণঘাতী রোগ-জীবাণুও সৃষ্টি হতে পারে।

১১. **বনাঞ্চল** : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা বেড়ে গেলে বনভূমির উপরও প্রভাব পড়বে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সমুদ্রের পানির উচ্চতা যদি ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়ে, তাহলে একমাত্র ম্যানগ্রোভ বনের ৭৫% পানির নিচে তলিয়ে যাবে। আর যদি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রায় পুরো সুন্দরবন ও এর জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। এছাড়া অধিক হারে বন-জঙ্গল ধ্বংস করার ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট (Climate Change and International Perspective)

আগামী দশকগুলোতে বিশ্ববাসীকে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ১৯৮৮ সালে গঠিত Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এর চতুর্থ মূল্যায়ন রিপোর্ট (AR4) অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিগত ১০০ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় ০.৭৪° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.১-৬.৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। অন্যদিকে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল বিলুপ্ত হবে। যা উদ্ভিদ ও প্রাণির বসবাসের অনুকূল পরিবেশে সরাসরি আঘাত হানার মধ্য দিয়ে ধ্বংস সাধন করবে।

১৯৬১-২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১.৮ সেন্টিমিটার সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০৮০ সালের মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৩৪ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে বিজ্ঞানীগণ ধারণা করছেন। এতে বাংলাদেশসহ মালদ্বীপ, মিশর, ভিয়েতনাম, ফিজি, কিরিবাতি প্রভৃতি দেশের উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া কৃষি জমি লবণাক্ত হয়ে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাবে। অন্যদিকে নাতিশীতোষ্ণ ও বিষুবরেখার থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে পানির প্রাপ্যতা বেড়ে যাবে এবং বিষুবরেখার নিকটবর্তী ও মাঝামাঝি স্থানে পানির প্রাপ্যতা কমে যাবে। অর্থাৎ কোনো অঞ্চলে বন্যার মাত্রা প্রকট হবে এবং কোনো কোনো অঞ্চলে খরা দেখা দিবে। একই সাথে বিশ্বব্যাপী ঘূর্ণিঝড় সংঘটনের হারও বৃদ্ধি পাবে যা ইতিমধ্যে দেখা যেতে শুরু করেছে এবং তা আরও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, মাটির উর্বরতা হ্রাস, প্রাকৃতিক জলাশয়ের উৎস বিনষ্ট হওয়া, খাদ্যে অনিরাপত্তা, বাস্তুসংস্থানের চক্র বিনষ্ট, ওজোন স্তরের কার্যক্রম নষ্ট হওয়া, সমুদ্রে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার পরিমাণ কমে যাওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে পৃথিবীবাসী। এছাড়া অসংখ্য মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে শরনার্থী হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে যে সকল প্রভাব পড়তে পারে তা একটি ছকে তুলে ধরে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করুন।

সারাংশ

জলবায়ু পরিবর্তন আজ বিশ্বব্যাপী উৎকণ্ঠার এক গুরুতর কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। মানুষের বহুবিধ কর্মকাণ্ডই মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। এছাড়া প্রাকৃতিক কারণও রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের ঋতুর পরিবর্তন, খরা, অস্বাভাবিক বন্যা, কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদন হ্রাস, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা যাবে অধিক মাত্রায়। আর বৈশ্বিকভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি উপকূলীয় অঞ্চলে প্লাবিত হওয়াসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে এবং বিঘ্নিত হবে মানুষের স্বাভাবিক জীবন। তাই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিগত একশত বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে?

(ক) ০.৭৪° সেলসিয়াস (খ) ০.৮৪° সেলসিয়াস

(গ) ০.৯৪° সেলসিয়াস (ঘ) ২.০৪° সেলসিয়াস

২। বাংলাদেশের কত প্রজাতির প্রাণি হুমকির সম্মুখীন?

(ক) ২৯টি (খ) ৩৯টি

(গ) ৪৯টি (ঘ) ৫৯টি

৩। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ-

i. বিশ্ব উষ্ণায়ন

ii. জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি

iii. যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.২ পরিবেশগত সমস্যাসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশগত সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পরিবেশগত সমস্যা

পরিবেশগত সমস্যাসমূহ

পরিবেশগত সমস্যাসমূহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা থেকে ভিন্নতর। বর্তমানে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সংকটময় পরিস্থিতি হচ্ছে আমাদের পরিবেশ। এ সংকটের পেছনে কতিপয় পরিবেশগত সমস্যা কাজ করছে। ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, নগরায়ন প্রভৃতি কারণে প্রকৃতি তার স্বাভাবিকতা ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে পরিবেশগত সমস্যা। নিম্নে প্রধান প্রধান পরিবেশগত সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি : পরিবেশেগত সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। আর পরিবেশগত অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণও মানুষ নিজেই। বর্তমানে বিশ্বে জনসংখ্যা প্রায় ৬.৬ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন= ১০০ কোটি)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ তা প্রায় ১০ বিলিয়নে দাঁড়াবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদী জমি ও বনজ সম্পদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কেননা অধিক জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের জন্য আবাদী জমি ও বনাঞ্চল কেটে বাসস্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাকেন্দ্র, শিল্পকারখানা, হাট-বাজার প্রভৃতি স্থাপন করা হয়।

চিত্র ৯.২.১ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবেশগত সমস্যা

১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ১৯.৩২ মিলিয়ন মেট্রিক টন যা ২০১০-১১ সালে দাঁড়ায় প্রায় ৩৬.০৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ২০১৩-১৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৮.১৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন। কিন্তু প্রতি বছরই উৎপাদন বৃদ্ধির পরও খাদ্য ঘাটতি থেকে যাচ্ছে অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য। সুতরাং বলা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

২. নগরায়ন : দ্রুত এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যা। নগরায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে এক ধরনের জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে অন্য এক জীবনধারা গৃহীত হয়। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় মানুষ গ্রামীন সহজ-সরল জীবনধারাকে অতিক্রম করে নগরীর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনধারা গ্রহণ করে তাকে নগরায়ন বলে। বিশ্বের গড় নগরায়নের হার ৩৮% হলেও বাংলাদেশে এ হার ২১%। তবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের নগরায়ন ক্রমবর্ধামন হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো- গৃহায়ন ও বস্তি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, পারিবারিক নিরাপত্তাহীনতা, অপরাধ প্রবণতা, নগরীয় ভূমিহীনতা, নগরীয় দারিদ্র, বেকারত্ব, নগরীয় সেবা ও অন্যান্য সুযোগ- সুবিধার অভাব।

৩. শিল্পায়ন : শিল্পায়ন মানব সভ্যতাকে উন্নয়নের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিলেও ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মারাত্মক পরিবেশগত হুমকির সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ায় শিল্পবর্জ্য পরিবেশকে দূষিত করছে।

৪. **পানি দূষণ ও বিশুদ্ধ পানির সংকট :** বিশুদ্ধ পানি সংকটের অন্যতম কারণ হলো পানি দূষণ। পানি দূষণের ফলে পানির ব্যবহার্যতা বিনষ্ট হয়। শিল্প বর্জ্য পানির অক্সিজেনের (Dissolved Oxygen) কমিয়ে দেয় এবং বসবাসকারী জীব ও উদ্ভিদ পরিমিত অক্সিজেনের অভাবে (Biological Oxygen Demand) ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশ্বব্যাপী বিশুদ্ধ পানি সংকটের কারণে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে শরনার্থী হয়ে যাবে।

৫. **বন্যজীবন ও জীববৈচিত্র্য :** মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের ক্রিয়াকার্য পরিবেশকে এমনভাবে বিঘ্নিত করছে যে বন্যজীবন ও জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখীন। যেমন- বাংলাদেশের বন্যজীবন ও জীববৈচিত্র্যের আধার সুন্দরবনেও মানুষের বহুমুখী কার্যকলাপের ফলে বাস্তুসংস্থানিক পরিবর্তন ঘটছে যা একটি অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা।

চিত্র ৯.২.২ নদীভাঙ্গন

৬. **নদীভাঙ্গন :** অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে নদীভাঙ্গন একটি প্রধান পরিবেশগত সমস্যা। বর্ষাকালে বিশাল এলাকা জুড়ে এই সমস্যা দেখা দেয়। কৃষি জমি, জনবসতি, হাট-বাজার, শহর-বন্দর নদীভাঙ্গনে বিলীন হয়ে যায় (চিত্র ৯.২.২)। এদেশে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা প্রভৃতি নদীর ভাঙ্গনে অসংখ্য লোক বাস্তুচ্যুত হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে ।

৫. **সামুদ্রিক দূষণ :** সামুদ্রিক দূষণের প্রধান উৎস শহরের শিল্পবর্জ্য, নদীবাহিত আবর্জনা, জাহাজ থেকে নির্গত তেল, পারমানবিক বিস্ফোরণ প্রভৃতি। এসব পদার্থ পানির গুণগত মানের অবনতি ঘটায়। ফলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরেও সাম্প্রতিক সময়ে দূষণমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সামুদ্রিক পরিবেশ। বিঘ্নিত হচ্ছে গলদা ও বাগদা চিংড়ির প্রজনন স্থল। এছাড়া উপকূলীয় এলাকার বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

৭. **আর্সেনিক দূষণ :** আর্সেনিক হচ্ছে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা ভূ-গর্ভস্থ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এটি একটি বিষাক্ত মৌলিক পদার্থ। আর্সেনিক মিশ্রিত পানি পান করলে প্রাথমিক অবস্থায় আর্সেনিকোসিস নামক রোগ হয়। বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক দূষণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ১৯৮৪ সালে। NIPSOM এর জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪১টি জেলারই নলকূপের পানিতে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অধিক মাত্রায় আর্সেনিক রয়েছে। সুতরাং এটি একটি ভয়াবহ পরিবেশগত সমস্যা ধারণ করতে পারে।

৮. **বায়ু দূষণ :** বায়ু দূষণ পরিবেশগত সমস্যামূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বায়ু বিভিন্নভাবে দূষিত হয় এবং তা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বায়ু দূষণ ঘটে থাকে যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া, জীবাশ্ম জ্বালানি ও পেট্রোলিয়াম দহন প্রভৃতি কারণে। বায়ু দূষণের আশঙ্কাজনক পরিণতি গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া (Green House Effect) যা পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া বায়ু দূষণের ফলে বিভিন্ন প্রকার রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে।

৯. **শব্দ দূষণ :** মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতার অতিরিক্ত আওয়াজই শব্দ দূষণ। মানুষের শ্রবণযন্ত্রের স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতা ১-৭৫ ডেসিবল। কিন্তু ৮৫ ডেসিবল অথবা তার অধিক হলে একজন মানুষ শ্রবণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। শব্দ দূষণ প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট উভয় কারণেই হতে পারে। তবে মানবসৃষ্ট কারণই মুখ্য। শব্দ দূষণের ফলে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয়। সাধারণত শহরাঞ্চলে পরিবেশগত এই সমস্যা অধিক হয়ে থাকে।

১১. **লবণাক্ততা :** বঙ্গোপসাগরে পতিত নদীগুলোর পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়ার দরুণ দক্ষিণ-পশ্চিমে উজানের দিকে ক্রমেই লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়ছে এবং গোটা অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা সমস্যা দেখা দিয়েছে। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর ও গোপালগঞ্জ লবণাক্ততায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ফলে কৃষি, মৎস্য চাষ, বনায়ন, শক্তি উৎপাদন, শিল্প ও অন্যান্য কার্যক্রম বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার পরিবেশগত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন।

সারাংশ

পরিবেশগত সমস্যাকে বহুবিধ ক্ষতির কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বব্যাপী বহুবিধ পরিবেশগত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এসব সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। মানুষের বহুমুখী কর্মকান্ডই পরিবেশকে প্রভাবিত করে থাকে। ফলে দেখা দেয় অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পায়ন, পানি দূষণ, বিশুদ্ধ পানির সংকট প্রভৃতি। এ সকল সংকট থেকে উত্তরণের জন্য পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি পরিবেশগত সমস্যা?
ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধি খ) বনায়ন
গ) সামাজিক নিরাপত্তা ঘ) কোনোটিই নয়

২। বায়ু দূষণের কারণ-
i. যানবাহনের ধোঁয়া
ii. কলকারখানার ধোঁয়া
iii. পেট্রোলিয়াম দহন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। বাংলাদেশের কোন জেলার মৃত্তিকায় লবণাক্ততা দেখা যায়?
ক) খুলনা খ) সাতক্ষীরা
গ) যশোর ঘ) সবগুলো সঠিক

পাঠ-৯.৩ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগহসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, সাইক্লোন, টর্নেডো, কালবৈশাখী

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুযোর্গসমূহ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে নতুন নয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা এবং তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী পাঠসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও পরিবেশগত সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য পাঠে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

বন্যা (Flood)

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জন্য বন্যা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ (চিত্র ৯.৩.১)। প্রতিবছরই দেশের কোনো না কোনো অঞ্চল প□াবিত হয় এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়, যা কখনো প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করে। যেমন ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের বন্যা ছিল প্রলয়ংকরী। বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের বন্যা সংঘটিত হয়। যেমন-মৌসুমী বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত বন্যা, আকস্মিক বন্যা ও উপকূলীয় বন্যা।

চিত্র ৯.৩.১ : বাংলাদেশের বন্যা

বন্যার কারণ : বর্জ্য অব্যবস্থাপনা, নদীভাঙ্গন ও নদীখননের অভাবে বাংলাদেশের নদীসমূহের পানি ধারণক্ষমতা কমে গেছে। যার দরুণ অতিবৃষ্টি, ভারীবর্ষণ এবং উজানের দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীন হতে ঢল আকারে নেমে আসা পানি খুব সহজেই নদীর কূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকাকে প্লাবিত করে। অপরদিকে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা সমতল হওয়ায় এবং পানি নিস্কাশনের পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকায় বৃষ্টির পানি জমে নগর বন্যা দেখা দেয়। এছাড়াও পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ি বৃষ্টিপাতের কারণে হঠাৎ বন্যা (Flash Flood) দেখা যায়।

খরা (Drought) : যখন কোন এলাকায় বা অঞ্চলে যখন মাটিতে পানির পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে, পানি শুন্য হয়ে যায়, ফলে গাছপালা ও শস্য জন্মাতে পারে না এবং মাটি ফেঁটে চৌচির হয়ে যায়, তখন এইরূপ অবস্থাকে খরা বলে (চিত্র ৯.৩.২)। যদিও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খরার সংজ্ঞা ভিন্ন। যেমন ব্রিটিশরা একটানা দুই সপ্তাহ ০.২৫ মিলিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হলে তাকে খরা বলে। রাশিয়াতে একটানা ১০ দিন মোট ৫ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি না হলে তাকে খরা বলে। বাংলাদেশে ১৯৭৮-৭৯ সালে ভয়াবহ খরা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের

চিত্র ৯.৩.২ : বাংলাদেশের খরা

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা খরার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এই অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও পানির অভাবে রোপা আমন আবাদের অসুবিধা হয় এবং ফলনও কমে যায়। আবার শীত মৌসুমেও বৃষ্টিপাতের তুলনায় অধিক মাত্রায় বাষ্পীভবনের কারণে মাটির আর্দ্রতা কমে যায় এবং রবিশস্যের ফলনে (লাউ, সিম, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, সরিষা, আলু) ব্যাপক ক্ষতি হয়।

খরার কারণ : বাংলাদেশে খরার প্রধান কারণ দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া, পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতা এবং গভীর নলকূপের সাহায্যে অতিরিক্ত ভূ-গর্ভস্থ পানির উত্তোলন। এছাড়াও নদীর গতিপথ পরিবর্তন, উজান থেকে পানি প্রত্যাহার, পানি সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার অভাব, ওজোন স্তরের ক্ষয় ইত্যাদিও খরা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় (Cyclone)

চিত্র ৯.৩.২ : উপকূলীয় সাইক্লোন

সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় হলো উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ঘূর্ণিঝড়ের সময় উপকূলীয় অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহের উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্নচাপজনিত কারণে প্রবলবেগে জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে ঘূর্ণন আকারে প্রবাহিত হয় এবং স্থলভাগে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। একে সাইক্লোন বলে।

গ্রিক শব্দ 'Kyklos', থেকে সাইক্লোন শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ Coil of Snakes বা সাপের কুণ্ডলী (চিত্র ৯.৩.৩)। সারা বিশ্বে ঘূর্ণিঝড় বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন-চীন ও জাপানের উপকূলে টাইফুন, দক্ষিণ এশিয়াতে সাইক্লোন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে হারিকেন, দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোতে টাইফুন, ফিলিপাইনের উপকূলে বাগুই এবং অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে উইলি উইলি বলা হয়। বাংলাদেশে এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড় বেশি দেখা যায়। ১৯৯১, ২০০৭ ও ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় ছিল সবচাইতে প্রলয়ংকরী। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার প্রাণহানি ঘটেছে। ২০০৭ ও ২০০৯ সালের সাইক্লোনে (যথাক্রমে সিডর ও আইলা) যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৭ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। এছাড়া লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে।

সাইক্লোন সৃষ্টির কারণ : সাইক্লোন সৃষ্টি হয় গভীর সমুদ্রে এবং আঘাত হানে উপকূলীয় এলাকায়। এই দুর্যোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ হলো উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্নচাপ। সাধারণত এই তাপমাত্রা ২৬.৫-২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি হওয়া প্রয়োজন এবং ঝড়ের সময় বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ ৬৫ কিলোমিটার বা তারও বেশি হয়। বঙ্গোপসাগরে প্রায় সারা বছরই এইরূপ তাপমাত্রা বিদ্যমান। এছাড়াও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ সাইক্লোনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দেশ।

টর্নেডো (Tornado) : টর্নেডো শব্দটির উৎপত্তি স্প্যানিশ শব্দ 'Tornada' থেকে যার অর্থ Thunder storm বা শব্দ বজ্রঝড়। সাইক্লোনের ন্যায় টর্নেডো সৃষ্টির মূল কারণও হলো বায়ুর নিম্নচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রা। টর্নেডোর ক্ষেত্রে বাতাসের গতিবেগ অনেক বেশি হয়। এই সাধারণ গতিবেগ ঘন্টায় ৪৮০ থেকে ৮০০ কিলোমিটার হতে পারে। টর্নেডোর সাথে সাইক্লোনের প্রধান পার্থক্য হলো সাইক্লোন সৃষ্টি হয় সাগরে এবং উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে অপরদিকে টর্নেডো যে কোনো স্থানেই সৃষ্টি হতে পারে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার ক্ষতিসাধন করতে পারে। বাংলাদেশে প্রলয়ংকরী টর্নেডো হয় ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়াতে। টর্নেডোর সাথে কালবৈশাখী ঝড়ের যথেষ্ট মিল রয়েছে। শুধু পার্থক্য হলো কালবৈশাখী ঝড় দুই ধরনের বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহের দরুণ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে হয় কিন্তু টর্নেডো যে কোনো সময় হতে পারে।

কালবৈশাখী (Nor-Wester) : বাংলাদেশে সাধারণত বৈশাখ (এপ্রিল-মে) মাসে কালবৈশাখী প্রবল বায়ুপ্রবাহ, ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রসহ ভূ-পৃষ্ঠের উপর আঘাত হানে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে ২০১৫ সালের ১৪ এপ্রিল মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় প্রলয়ংকরী কালবৈশাখী ঝড়ে শতাধিক মানুষ আহত হয় এবং ২৪ জন মানুষ মারা যায়।

বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৪০ হতে ৮০ কিলোমিটার। বাংলাদেশে কালবৈশাখী ঝড়ের প্রধান কারণ দেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু এবং উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর মুখোমুখি সংঘর্ষ। এই সময় বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎপূর্ণ ঝড় সৃষ্টি হয়। এই ঝড় বৈশাখ মাসে কখনও চৈত্রমাসে উত্তর পশ্চিম দিক হতে আগত বলেই নাম দেওয়া হয় কালবৈশাখী ঝড় । তবে গ্রীষ্মকালীন উত্তর পশ্চিম ঝড় বা বজ্র বিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়ও বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের তালিকা প্রণয়ন করুন

সারাংশ

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ হলো বন্যা, খরা, সাইক্লোন, টর্নেডো এবং কালবৈশাখী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঘূর্ণিঝড়ের বৈশিষ্ট্য-
i. ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় গভীর সমুদ্রে এবং উপকূলে আঘাত হানে
ii. ঘূর্ণিঝড়ের জন্য প্রয়োজন উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্নচাপ এবং
iii. সাধারণত তাপমাত্রা ২৬.৫-২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি হওয়া প্রয়োজন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) i, ii ও iii ঘ) iii

২। বাংলাদেশে স্থলভাগে বৈশাখ (এপ্রিল-মে) মাসে প্রবল বায়ুপ্রবাহ, ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রসহ যে ঝড় হয় তাকে কী বলে?
ক) কালবৈশাখী খ) সাইক্লোন
গ) টাইফোন ঘ) টর্নেডো

পাঠ-৯.৪ প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য ও কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	প্রকৃতি, সংরক্ষণশীলতা

প্রকৃতি সংরক্ষণশীতার তাৎপর্য

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সকল সম্পদই প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন- সৌরতাপ, আলো, বাতাস, গাছপালা, পশুপাখি, নদ-নদী, সাগর, মহাসাগর, হ্রদ, হিমবাহ, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ প্রভৃতি। মানুষ ও প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের পারস্পরিক আন্ত:ক্রিয়ার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে জীবমন্ডল।। তাই জীব ও প্রাণীর টিকে থাকার জন্য প্রকৃতি সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি বা ধ্বংস না করে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারই হলো প্রকৃতি সংরক্ষণ। যেমন সৌরবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাসের ব্যবহার প্রভৃতি। প্রকৃতি সংরক্ষণের অভাবে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রত্যক্ষ ফলাফল হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের (বন্যা, খরা, সাইক্লোন, টর্নেডো, ভূমিধ্বস, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, সুনামী) সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়ছে। বলা যায়-মানুষ প্রকৃতিকে সংরক্ষণ না করলে প্রকৃতিতে মানুষ ও জীবের টিকে থাকাই হবে প্রায় অসম্ভব।

প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার কৌশল

প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার কৌশলসমূহ নিম্নরূপ। যথা-

১। প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ,
২। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ,
৩। নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি,
৪। সম্পদের সীমিত ও পুন:ব্যবহার
৫। সচেতনতা বৃদ্ধি

১। **প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ :** প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার প্রধান কৌশল হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ।

১.১ পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ : হাসপাতাল, গৃহস্থালী, কলকারখানার বর্জ্য, নৌযানে ব্যবহৃত জ্বালানী, মলমূত্র এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা প্রতিনিয়ত নদ-নদীর পানি দূষিত করছে। যেমন-দূষণের কারণে বুড়িগঙ্গা নদীতে কোন জলজ প্রাণী নেই, এছাড়া পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুর্গন্ধের কারণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে। তাই প্রতিটি শিল্পকারখানা হাসপাতালে বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। অথবা কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধানাগার প্রয়োজন যাতে নদ-নদীর পানি দূষিত না হয়।

১.২ : বনজ সম্পদ সংরক্ষণ : বনজ সম্পদ সংরক্ষণের পূর্ব শর্ত হচ্ছে বনায়ন। যে হারে গাছ কাটা হয় তার তিনগুণ হারে গাছ লাগাতে হবে। এতে যেমন বনজ সম্পদ রক্ষা হয় তেমনি পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা হবে। বনজ সম্পদ ব্যবহারের বিকল্প বের করতে হবে। যেমন কাঠের বিকল্প হিসাবে প্লাইউড ব্যবহার করা যায়। অফিস-আদালতের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট চিঠির পরিবর্তে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা যায়। প্রয়োজনীয় নথির সংরক্ষণের জন্য হার্ডকপির (কাগজ) পরিবর্তে সফ্টকপি (কম্পিউটার) সংরক্ষণ করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা ই-বুক ব্যবহার করতে পারে।

১.৩ : খনিজ সম্পদ সংরক্ষণ : বাংলাদেশের প্রধান খনিজসম্পদ হলো-প্রাকৃতিক গ্যাস। এছাড়াও রয়েছে কয়লা, খনিজ তেল, চুনাপাথর প্রভৃতি। বর্তমানে বাংলাদেশ গৃহস্থালী, কলকারখানা এবং যানবাহনে প্রধান জ্বালানী হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে। তাই এই সম্পদ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে যেমন-রান্নার পর গ্যাসের চুলা নিভিয়ে ফেলতে হবে। প্রাইভেট

গাড়ির পরিবর্তে কমিউনিটি বাস সার্ভিস চালু করা উচিত। যেমন স্কুলসমূহে একজন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি প্রাইভেট গাড়ি ব্যবহার না করে ২০ জন ছাত্র/ছাত্রীর জন্য কমিউনিটি বাস সার্ভিস চালু করা যায়। এতে খনিজ সম্পদ সাশ্রয়ের পাশাপাশি নগরের যানজটও নিরসন হবে।

২. **পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ :** বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ স্বাভাবিক ঘটনা হলেও পরিবেশ দুষণের ফলে যে জলবায়ুগত পরিবর্তন হচ্ছে তাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা, তীব্রতা ও স্থায়িত্ব বাড়ছে। যার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বাড়ছে। তাই পরিবেশ দূষণ (বায়ুদুষণ, পানি দুষণ) কমাতে হবে।

৩. **নবায়ণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি :** অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের (প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, জিপসাম, ডিজেল, কেরোসিন) ব্যবহার কমিয়ে নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের (সৌরবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস বা জৈবগ্যাসের) ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। যে সকল সম্পদ একবার ব্যবহার করলে শেষ হয়ে যায় তাদের অনবায়নযোগ্য সম্পদ (Non renewable resource) বলে। অপরদিকে যে সকল সম্পদ ব্যবহার করলে শেষ হয়ে যায় না তাকে নবায়নযোগ্য সম্পদ (Renewable resource) বলে। যেমন- বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংযোগ নেই সেখানে একটি পরিবারের তিন/চারটি গরুর গোবর খুব সহজ উপায়ে গর্ত করে একই জায়গায় ফেললে যে জৈব গ্যাস বা বায়োগ্যাস উৎপাদিত হয় তাতে একটি পরিবারের গ্যাসের চাহিদা পূরণ হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ গরুর খামার মালিক জৈবগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেদের গ্যাসের চাহিদা পূরণ করছে। তারা বাণিজ্যিকভাবেও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পরিবারের গ্যাসের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এই গ্যাস খুবই উৎকৃষ্ট মানের। এতে মিথেনের পরিমাপ শতকরা ৯৮ ভাগ। এতে প্রাকৃতিক গ্যাসের যেমন সাশ্রয় হচ্ছে তেমনি বনজ সম্পদেরও সংরক্ষণ হচ্ছে।

৪. **সম্পদের সীমিত ব্যবহার ও নতুন পণ্য তৈরি :** আসবাবপত্র এবং কাগজ তৈরি হয় গাছপালা থেকে। জাঁকজমকপূর্ণ করার জন্য অফিস আদালত বাড়িঘরে কাঠের ডেকোরেশন এবং আসবাবপত্রের ব্যবহার সীমিত করতে হবে। কাপড় চোপড় জাতীয় পণ্যে ৭টি কাগজের স্টীকার লাগানো থাকে। যেখানে ১টি স্টীকারেই যথেষ্ট। পুরাতন জিনিস থেকে নতুন জিনিস তৈরি করে প্রকৃতি সংরক্ষণ করা যায়। যেমন- গৃহস্থালির কাজে অ্যালোমোনিয়ামের তৈজসপত্র পুনঃব্যবহার করা যায়। এছাড়াও গৃহস্থালির বর্জ্য থেকে জৈব সার প্রস্তুত করা যায়।

৫. **সচেতনতা বৃদ্ধি :** শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব সকল শ্রেণিপেশার মানুষকে প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যেমন কৃষক কীটনাশকের ব্যবহার সীমিত করবে, সেই সাথে জৈবসার ও জৈবগ্যাস ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে। শিল্পকারখানার মালিক শিল্পবর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা করবে। ব্যবসায়ীরা কাগজের স্টিকার, প্যাকেট ব্যবহার সীমিত করবে, স্কুল, কলেজ অফিস-আদলতে কাগজের ব্যবহার সীমিত করবে। দুষ্কৃতিকারীরা যাতে সুন্দরবনের হরিণ, বাঘ শিকার, গাছ চুরি করতে না পারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। অর্থাৎ প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নগরে অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এর অন্যতম কারণ পলিথিন এবং এজাতীয় বর্জ্য রাস্তায় পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করে তাই এজাতীয় বর্জ্য রাস্তায় স্থাপিত ডাস্টবিনে ফেলতে হবে। উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে লিখুন

সারাংশ

সাম্প্রতিক সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্থায়িত্ব, তীব্রতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতিকে আমরা ধ্বংস করলে প্রকৃতি আমাদেরকে টিকে থাকতে দিবে না। তাই প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনো দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি প্রয়োজন কিন্তু বাংলাদেশের রয়েছে মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ। তাই আমাদের প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতায় অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার বিভিন্ন কৌশল হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে শতকরা কতভাগ বনভূমি রয়েছে?
ক) ১৭ ভাগ খ) ১৮ ভাগ
গ) ১৫ ভাগ ঘ) ১৩ ভাগ

২। নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি?
ক) সৌরশক্তি খ) প্রাকৃতিক গ্যাস
গ) কেরোসিন ঘ) চুনাপাথর

৩। গবুর গোবর থেকে তৈরি হয়-
i) উৎকৃষ্ট মানের বায়োগ্যাস বা জৈবগ্যাস
ii) উৎকৃষ্ট মানের জৈবসার
iii) মিথেনের পরিমাণ শতকরা ৯৮ ভাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) ii খ) i ও ii গ) i, ii ও iii ঘ) iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. টর্নেডো শব্দটির অর্থ কী?
খ. জলবায়ু পরিবর্তন হওয়ার কারণ কী?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কী বুঝাচ্ছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. " বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য মানুষের কর্মকান্ডই দায়ী"- ব্যাখ্যা করুন।

২। সৃজনশীল প্রশ্ন

করিম মিয়ার বাড়ি পটুয়াখালি জেলায়। ২০০৭ সালে হঠাৎ উপকূলীয় এলাকায় প্রচন্ড ঝড়ে ঘরবাড়ি সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যায়। আশ্রয় কেন্দ্রে যাননি বলে তিনি ছাড়া পরিবারের সকল সদস্য মারা যায়। এখন করিম মিয়ার শুধুই আফসোস কেন তিনি আশ্রয় কেন্দ্রে গেলেন না।

ক) জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কী বুঝায়? ১
খ) প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার কৌশলসমূহ উল্লেখ করুন। ২
গ) উদ্দীপকের প্রাকৃতিক দুর্যোগটি কীভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) করিম মিয়া এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে পারতেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২ : ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪ : ১। ক ২। ক ৩। গ